স্বাবলম্বী

স্বাবলম্বী ৪০ বর্ষ ২য় সংখ্যা
এপ্রিল-জুন ২০২৩

সম্পাদনা উপদেষ্টা
মো: ইয়াকুব হোসেন
মো: মাসুদ হাসান
রনদা প্রসাদ সাহা
মুস্তাফিজুর রশিদ মৃধা
মো: মাসুদ রায়হান

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক
রিজওয়ান আহমেদ

কম্পোজিশনে
উম্মে সালমা

প্রকাশক
মো: ইয়াকুব হোসেন
নির্বাহী পরিচালক
ভার্ক।

আমাদের কথা

স্বাবলম্বী একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা। এর প্রতি সংখ্যায় যেমন উক্ত সময়কালের অন্তর্ভূক্ত দেশীয় ও বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার ঘোষিত বিশেষ দিবসগুলোকে লক্ষ্য রেখে তথ্য পরিবেশন করা হয় তেমনি পানি-পয়নিস্কাশন, শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, যোগাযোগ, স্বাস্থ্য, ঋণ প্রভৃতি বিষয়ক বিভিন্ন অগ্রগতি, নতুন নতুন পদক্ষেপ ও সচেতনতামূলক বিভিন্ন লেখা প্রকাশ করা হয়। ভার্ক সব সময়ই টেকসই সামাজিক উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে। তাই সকল প্রকল্পেই ভার্ক জনগণের পাশাপাশি স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণকে টেকসই সামাজিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত বলেই বিশ্বাস করে।

স্বাবলম্বীর প্রতিটি সংখ্যায়ই আমরা চেষ্টা করে থাকি বিভিন্ন সেবা সংক্রান্ত সাধারণ জনগণের সচেতনতার সিদ্ধান্তমূলক তথ্য উপস্থাপন করতে ও প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন অভিজ্ঞতা সকলকে জানাতে। তৃণমূল পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন সংস্থা এ ব্যাপারে কার্যকর ভূমিকা পালন করলেও আমরা মনে করি এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই আন্তরিকতা নিয়ে এগিয়ে এলেই ঐসব সুবিধা বঞ্চিত জনগণকে এই সেবা প্রদান নিশ্চিত করা সম্ভব।

সূচিপত্রঃ

আমাদের কথা ১
মাসিককালীন সময়ে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইয়ুথ লিডারশিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা..... ২
ভার্কের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা (জানুয়ারি-মার্চ ২০২৩) অনুষ্ঠিত ৪

সাফল্য গাঁথা
শাহীন একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চায় ৫
সুমনের স্বপ্ন লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হওয়া ৬
পথচারি বানেচা খাতুন দু'চোখ দিয়ে এখন দুনিয়া দেখে ৭
ঘুরে দাঁড়িয়েছে কুলসুম ৮
গবাদি পশু পালনে সফল রহিমা বেগম ১০

এসডিজি
এসডিজি বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা ১১

স্বাস্থ্য ও পরিবেশ
"ডেঙ্গু" আতঙ্ক নয় সচেতনতা ও প্রতিরোধই প্রতিকার ১২
একজন ডিমেনশিয়ার বন্ধু হন ১৩
বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ইতিহাস ১৬

পুরানো দিনের স্মৃতি
অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভিইআরসি'র ভূমিকা ১৭
জুন মাসের নামের উৎস ১৯

কচি হাতের কলম থেকে
সীমা নাই ২০
ছোট্ট শিখন কেন্দ্র ২০

VERC

মাসিককালীন সময়ে পুরুষের ভূমিকা নিয়ে ইয়ুথ লিডারশিপের মাধ্যমে স্বাস্থ্য সচেতনতা

সোমা দে, হাইজিন ব্যবস্থাপক, প্রোভিশন অফ লাইফ সেভিং ওয়াশ সার্ভিসেস, ভার্ক, উখিয়া।

আমি মোহাম্মদ সেলিম, বয়স ২৪ বছর, পিতার নাম আব্দুর রহমান, মাতার নাম নুর আয়েশা, FCN-৬০২২৯০। মিয়ানমারের আরকান রাজ্যের মংডু জেলার ফকিরা বাজার গ্রামে বাস করতাম। পরিবারে পাঁচ ভাই ও তিন বোনের মধ্যে আমি সবার বড়। আমি মিয়ানমারের নবম গ্রেড পর্যন্ত পড়া লেখা করেছি, বর্তমানে বিবাহিত এবং আমাদের এক জন মেয়ে সন্তান রয়েছে। ২০১৭ সালের ২৫ শে আগস্ট তারিখে মায়ানমার সরকার কর্তৃক বর্বর হামলার শিকার হয়ে প্রাণ বাঁচানোর উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছিলাম। বাংলাদেশে এসে কক্সবাজার জেলার উখিয়া উপজেলার অন্তর্গত বালুখালী ক্যাম্প ৮W এর F ব্লকের A-৬২ সাব ব্লকে বসবাস করতে শুরু করি। ক্যাম্পে শুরু থেকেই বিভিন্ন ওয়াশ প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতাম, পরবর্তীতে ভার্কের ওয়াশ প্রোগ্রামে তরুণদের নিয়ে কার্যক্রম শুরু হলে, ২০২২ সালের মার্চ মাসে F ব্লকের A-৬২ সাব ব্লকে তরুন (ইয়ুথ) লিডার হিসেবে আমি অর্ন্তভূক্ত হয়েছিলাম। মিয়ানমারে থাকাকালীন সময়ে স্বাস্থ্যবিধি এবং মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে তেমন ভাল ধারণা ছিলনা। ধর্মীয় ও সামাজিক বিভিন্ন মনোভাবের কারণেই নারীদের মাসিক বিষয়টি আমার নিজের কাছে লজ্জার ছিল ।

ক্যাম্পে ভার্ক এর বিভিন্ন হাইজিন প্রোমোশন মিটিং এবং মাসিককালীন সময়ে পুরুষের ভূমিকা শীর্ষক কার্যবিধিতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে মাসিককালীন স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বিভিন্ন রকম তথ্য জানতে পারি। একজন পুরুষ মানুষ তার মা, বোন অথবা স্ত্রীর মাসিক হলে তাদেরকে কিভাবে সহযোগিতা করতে হবে সে সম্পর্কে জানতে পারি। মোহাম্মদ সেলিম বলেন, "আমি এখন আমার পরিবারের নারী সদস্য কারও মাসিক হলে তাদের খাওয়ার পানি বা ব্যবহৃত পানি সংগ্রহে সাহায্য করি, ভারি কাজে সহযোগিতা করি এবং তাদের জন্য পুষ্টিকর খাবার ব্যবস্থা করি। মাসিককালীন সময় ব্যবহার করা কাপড় বা ন্যাপকিন প্যাড কোথায় ফেলতে হবে? এবং ব্যবহৃত কাপড় কিভাবে পরিস্কার করবে? কোথায় শুকাতে হবে? শুকানো কাপড় কোথায় সংরক্ষণ করে রাখতে হবে? এই সব বিষয়ে সঠিক তথ্য পরিবারের নারীদের প্রদান করি।"

মোহাম্মদ সেলিমের এই ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে তার স্ত্রী জুনায়েদা বেগম বলেন, "বিয়ের পর থেকেই আমার স্বামী মাসিক চলাকালিন সময়ে আমার অসুবিধা ও কষ্ট বুঝতে চেষ্টা করত না! ভার্কের তরুন (ইয়ুথ) লিডার দলের সদস্য হওয়ার পর থেকে মাসিকের সময় আমাকে পরিবারের বিভিন্ন কাজে সহযোগিতা করে! যে কোন ধরনের ভারি কাজ যেমন - ট্যাপ-স্ট্যান্ড ও টিউবওয়েল থেকে পানি সংগ্রহ করে। বর্তমানে সে হাইজিন ও মাসিক স্বাস্থ্য নিয়ে সচেতন এবং ক্যাম্পের অন্য পুরুষদের কাছে এই সচেতনতার বার্তা পৌঁছে দিচ্ছে। তাই এখন আমি আমার স্বামীকে নিয়ে গর্ববোধ করি।"

মোহাম্মদ সেলিম আরও বলেন, "মাসিক বিষয়টি কতোটা গুরুত্ব বহন করে সে বিষয়ে আমার ধারণা ছিলো না। 'মাসিক' এটি আল্লাহ প্রদত্ত একটি পদ্ধতি, সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারীদের একটি নির্দিষ্ট বয়সে মাসিক শুরু হয়, আবার বন্ধ হয়েও যায়, এসব নিয়ে আমারও আগে ভ্রান্ত ধারণা ছিলো, কিন্তু ভার্কের মাধ্যমে সঠিক তথ্য গুলো জানতে পারি। বর্তমানে আমি খুবই খুশি যে এইসব তথ্য গুলো একজন ইয়ুথ লিডার হিসেবে ক্যাম্পের অন্যান্য পুরুষ জনগোষ্ঠীর কাছেও পৌঁছে দিতে পারছি। এছাড়াও, একজন ইয়ুথ লিডার হিসেবে আমি ক্যাম্পের অন্যান্য কার্যক্রম যেমন- মানুষকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিয়ে সচেতন করা, বিতরণকৃত মালামাল সঠিকভাবে ব্যবহার করা, যেখানে-সেখানে ময়লা না ফেলা ইত্যাদি নিয়ে আমি কাজ করি কিন্তু আমার কাছে ভার্কের মাসিক নিয়ে নারীদের পাশাপাশি পুরুষদেরও অন্তর্ভুক্ত করে যে কার্যক্রম ক্যাম্পে চলমান আছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়। তাই আমি নিয়মিত ক্যাম্পে "Male Engagement in MHM" কার্যক্রম এ অংশগহণ করি ও সেই অনুযায়ী আমার পরিবারের নারী সদস্যদের সাহায্য করি এবং অন্যান্যদেরও মাসিক বিষয়ক কুসংস্কার থেকে বের হয়ে তাদের পরিবারের নারী সদস্যদের দেখাশোনা করতে সচেতন করি।"

আমি ভার্ককে ধন্যবাদ দিতে চাই এমন একটি সুন্দর ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে ক্যাম্পে কাজ করার জন্য এবং একজন ইয়ুথ লিডার হিসেবে আমার কমিউনিটির মানুষ, বিশেষ করে নারীদের স্বাস্থ্যসেবায় কাজ করার জন্য এবং আমার মধ্যে সচেতনতা তৈরির সুযোগ করে দেয়ার জন্য।

ভার্কের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৩) অনুষ্ঠিত

ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) এর ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা (জানুয়ারী-মার্চ ২০২৩) গত ০৭-০৮ মে ২০২৩ ভার্কের প্রধান কার্যালয় সাভার, ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, জনাব মো: ইয়াকুব হোসেন, উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন জনাব মো: মাসুদ হাসান, উপ-নির্বাহী পরিচালক, জনাব রনদা প্রসাদ সাহা, পরিচালক, মাইক্রোফাইনান্স, জনাব মুস্তাফিজুর রশীদ মৃধা, পরিচালক, মানব সম্পদ ও প্রশাসন এবং জনাব মাসুদ রায়হান, পরিচালক, অর্থ, ভার্ক। সভায় বিগত তিন মাসে ভার্কের যে সব প্রকল্পের আওতায় কার্যক্রমসমূহ মাঠপর্যায়ে বাস্তবায়িত হয়েছে তার বিশদ প্রতিবেদনসমূহ উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি উক্ত প্রকল্পগুলো ভবিষ্যতে আরো কিভাবে সঠিক ও কার্যকরভাবে বাস্তবায়ন করা যায়, সেই সম্পর্কে সংস্থার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নিকট হতে দিকনির্দেশনা দেয়া হয়। পরবর্তীতে ভার্ক কর্তৃক পরিচালিত ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচীর আওতায় যে সব এলাকায় কার্যক্রমসমূহ পরিচালিত হচ্ছে তার বিস্তৃত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয় ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা ও পরামর্শ প্রদান করা হয়। সভার পরবর্তী সময়ে সংস্থার হিসাব ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানব সম্পদ ও প্রশাসন, মনিটরিং, প্রশিক্ষণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা সংক্রান্ত প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়। দুই দিন ব্যাপী এই সভায় উপস্থিত ছিলেন ভার্কের মাঠ পর্যায়ের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত সহকারী পরিচালকগণ, প্রকল্প সমূহের ফোকাল পারসনগণসহ কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে কর্মরত বিভিন্ন সেকশনের উপ-পরিচালক ও সহকারী পরিচালকগণ।

শাহীন একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চায়

মো: লিয়াকত আলী, টেকনিক্যাল অফিসার, রায়পুরা, নরসিংদী, ভার্ক।

শাহীন মিয়া। এগার বছর বয়সী একজন কিশোর। নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চান্দের কান্দি ইউনিয়নের বড়কান্দা গ্রামে তাদের বাড়ি। শাহীন এর পিতা মো: কবির হোসেন একজন ভূমিহীন কৃষক এবং তার মাতা রেনু বেগম একজন গৃহিনী। প্রতিবেশীর জমিতে বর্গাচাষী হিসেবে চাষাবাদ করে তাদের পরিবার জীবিকা নির্বাহ করে। শাহীন মিয়ার জন্ম হতেই তার একটি পা অসমর্থ এবং সে স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারেনা। প্রায় তিন বছর আগে তার পিতামাতা তাকে নিকটবর্তী বড়কান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করে দিয়ে ছিলো কিন্তু করোনার প্রাদুর্ভাব এর কারণে ২য় শ্রেণীতে পাঠরত অবস্থায় স্কুল বন্ধ হয়ে যায় এবং তার পড়াশুনা থেমে যায়। ২০২০ সালের সেপ্টেম্বর-এর দিকে করোনা ভাইরাস এর প্রভাব যখন কমে এসেছিলো তখন দেশী বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহ শিক্ষা বাধাগ্রস্ত প্রাথ মিক স্তরের শিশুদের বিদ্যালয়ে নিরাপদে ফিরিয়ে আনা কার্যক্রম নিয়ে কাজ করছিলো।

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা ইউনিসেফ করোনা কালীন বাধাগ্রস্ত শিক্ষার কারনে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মৌলিক শিক্ষার ঘাটতি পুরনের জন্য ২০২২ সালের জুন মাস হতে এ অঞ্চলে কমিউনিটি ভিত্তিক "চলো আনন্দে শিখি" শিখন কর্মসূচি চালু করে। নরসিংদী জেলার রায়পুরার চান্দেরকান্দি ইউনিয়নের বড় কান্দাতে ও একটি কমিউনিটি ভিত্তিক শিখন কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ নেয়া হয়। অন্যান্য প্রতিবেশীর ন্যায় রেনু বেগম ও জানতে পারেন এ বিকল্প শিখন সহায়তামূলক কেন্দ্র স্থাপনের কথা। তিনি তার শিশুকে এই কেন্দ্রে পড়ানোর জন্য জরিপ ফর্মে তার নাম অন্তর্ভুক্ত করান। প্রায় ২ মাসের মধ্যে এখানে ইউনিসেফের সহায়তায় ভার্ক কেন্দ্র স্থাপন করে। অন্যান্য শিশুদের মতো শাহীন মিয়া ও এই কেন্দ্রের একজন নিয়মিত ছাত্র। শিক্ষিকা শান্ত বেগম বলেন, "শাহীন মিয়া অন্যান্য শিশুদের মতো চলাফেরা করতে না পারলেও সে পড়া শুনায় অত্যন্ত মনোযোগী। সে প্রতিদিন কেন্দ্রে আসে এবং আমি তাকে গণিত এবং ইংরেজীর মৌলিক জটিল বিষয়সমূহ ব্যক্তিগত ভাবে সহায়তা প্রদান করি।" শাহীন মিয়া বাংলা গনিত এবং ইংরেজী বিষয়সমূহ ভালভাবে বুঝতে শিখেছে। সে স্থানীয় প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুলধারায় সাফল্য জনকভাবে ফিরে যেতে সক্ষম হবে বলে শিক্ষিকা শান্তা বেগম অভিমত ব্যক্ত করেন। ভবিষ্যতে শাহীন উচ্চতর শ্রেণীতে পড়াশুনা করে একজন আদর্শ শিক্ষক হতে চায় । শাহীন এর পিতামাতা ভার্ক এবং ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষের নিকট কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। সে সকলের দোয়া চায়।

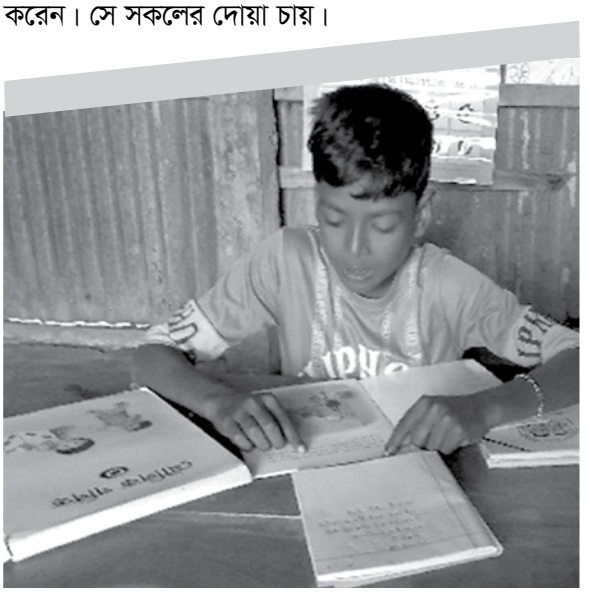

সুমনের স্বপ্ন লেখাপড়া শিখে স্বনির্ভর হওয়া

মো: লিয়াকত আলী, টেকনিক্যাল অফিসার, রায়পুরা, নরসিংদী, ভার্ক।

সুমনের পিতা শ্রমজীবি রতন মিয়া। তার গ্রামের বাড়ি নরসিংদী জেলার রায়পুরা উপজেলার চর আড়ালিয়া গ্রাম। জীবিকা উপার্জনের আশায় রতন মিয়া রায়পুরা ছেড়ে নরসিংদী পৌরসভার ৯নং ওয়ার্ডে বাসা ভাড়া নেন। স্থানীয় কারখানায় সুতা বুননের কারখানায় কাজের জন্য অনেক চেষ্টা করেও যখন ও খুঁজে পেলেন না তখন অগত্যা তিনি রিকশা চালনার পেশা বেছে নিলেন। এই পেশা তার জীবনের জন্য বড় বাধা হয়ে দাড়ালো। হঠাৎ তিনি একদিন শারীরিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এদিকে সংসারে তার চারটি সন্তান। দুই ছেলে, দুই মেয়ে ও স্ত্রী সহ ৬ জনের পরিবারে উপার্জনের আর কোন পথ না পেয়ে তিনি চরম হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন। তার স্ত্রী হনুফা বেগম প্রতিবেশীর বাড়িতে গৃহস্থালীর ও রান্না বান্নার সহায়তার কাজ বেছে নিলেন। রতন মিয়া অসুস্থ অবস্থায় স্থানীয় বাজারে সামান্য কিছু হাতের কাজের সন্ধান পেলেন।

এতেও যখন তার পারিবারিক খরচ ও চিকিৎসা মেটাতে পারছিলেন না তখন তিনি বাধ্য হয়ে তার বড় ছেলে সুমন

মিয়াকে স্থানীয় প্রতিবেশী মো: কামরুজ্জামান এর একটি সুতার ছোট গৃহ ভিত্তিক কারখানায় সাপ্তাহিক ৫০০ টাকা মজুরিতে কাজে লাগিয়ে দিলেন। সুমন মিয়ার বয়স ১১। কিশোর বয়সেই সংসারের অস্বচ্ছলতার কারনে সুতার কারখানায় কাজ করতে লাগলো। কারখানার মালিক কামরুজ্জামান মিয়া সুমনের মত আরও ৫ জন শিশুকে দিয়ে সুতার রোল গুটানোর কাজে নিয়োগ করেছেন। সুমনের কাজের আন্তরিকতা দেখে কারখানার মালিক কামরুজ্জামান মিয়া সন্তুষ্ট হলেন। সুমন প্রতিবেশী শিশুদের নিকটবর্তী শালিধা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে দেখে একদিন কারখানার মালিককে বলে যে সেও বিদ্যালয়ে যেতে চায়। কিন্তু তার ইচ্ছে হলে কি হবে। যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্লাস শুরু হয় তখন তাকে কারখানায় যেতে হয়। সুমনের আগ্রহের কথা শুনে সুমনের মা খুজতে থাকলেন কোথাও বিকল্প সময়ে শিশুদের মৌলিক শিক্ষাদানের কোন স্কুল আশে পাশে চালু আছে কিনা। ইতিমধ্যে হনুফা বেগম প্রতিবেশীদের মাধ্যমে শুনতে পেলেন ইউনিসেফ এর সহায়তায় ভিলেজ এডুকেশন রিসোর্স সেন্টার (ভার্ক) শালিধা অঞ্চলে সুবিধা বঞ্চিত শিশুদের মৌলিক শিক্ষাদানের জন্য কমিউনিটি ভিত্তিক 'চলো আনন্দে শিখি' শিখন কেন্দ্রে স্থাপন করতে চলেছে। হনুফা বেগম সুতার কারখানা মালিকের কাছে গিয়ে অনুরোধ করলেন যে দিনের দুইঘন্টা সময় যদি তিনি সুমনকে ছুটি দেন তাহলে সুমন প্রাথমিক শিক্ষার মৌলিক শিখনের একটা সুযোগ পাবে এবং পরবর্তী কালে তার কারখানার মালামাল গননার ও হিসাবরক্ষণের কাজে ও সহায়তা করতে পারবে। অনেক চিন্তা করে কারখানার মালিক মো: কামরুজ্জামান তার প্রস্তাবে রাজী হলেন। মালিকের সম্মতি শুনে হনুফা বেগম খানা জরিপকারীর কাছে শ্রমজীবী শিশু হিসেবে সুমন মিয়ার নাম ও পারিবারিক তথ্য প্রদান করলেন। চূড়ান্ত জরিপের শেষে সুমন মিয়াকে চলো আনন্দে শিখি শিখন কেন্দ্রের শিশু হিসেবে নিবন্ধিত করা হয়।

সুমন মিয়া বর্তমানে রাজাদি চলো আনন্দে শিখি শালিধা কেন্দ্রের একজন নিয়মিত শিশু। প্রতিদিন তার কারখানার মালিক তাকে দুই ঘন্টা সময় ধরে এই কেন্দ্রে পড়াশোনার জন্য সুযোগ দিয়েছেন। শালিধা কেন্দ্রের শিক্ষিকা আমেনা আক্তার বলেন "সুমন পড়াশোনায় অত্যন্ত আন্তরিক"। সে প্রতি দিন সকাল ৮টার ক্লাস সেশনে অংশগ্রহণ করে এবং সকাল ১০টায় বিদ্যালয় পাঠ শেষে পুনরায় কারখানার কাজে ফিরে যায়। সুমনের পিতা মাতা তার শিশুকে এই শিখন সহায়তা প্রদানের জন্য ভার্ক এবং ইউনিসেফ কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। সুমন পড়াশুনা করে স্বাবলম্বী হতে চায় এবং তার পরিবারের আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করতে চায় ।

পথচারি বানেচা খাতুন দু'চোখ দিয়ে এখন দুনিয়া দেখে

সাবরিনা আফরিন, সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, লক্ষণপুর ইউনিয়ন, ভার্ক।

পথচারি বানেচা খাতুন দু'চোখ দিয়ে এখন দুনিয়া দেখে। কথাটির ভাষা অন্যরকম হলেও বাস্তবতা একই রকম। নাম-বানেচা খাতুন, বয়স-৭৫, পিতা-মৃত রঙ্গু মিয়া, মাতা-সামু খাতুন, গ্রামের নাম-বরল্লা, উপজেলা-মনোহরগঞ্জ, জেলা-কুমিল্লা। তার পিতা রঙ্গু মিয়া ছিলেন খুবই দরিদ্র মানুষ ফলে বানেচাকে খুব বেশি লেখাপড়া করাতে পারেন নাই। তার বয়স যখন ২২ বছর তখন তাকে পার্শ্ববর্তী গ্রাম নারায়নপুর গ্রামের আব্দুল হাকিমের ছেলে লোকমান হোসেনের সাথে বিবাহ দেন। লোকমান হোসেন একজন দিনমজুর ছিলেন এবং খুব কষ্ট করে সংসার চালাতেন, এরই মাঝে কোল জুড়ে আসে পর পর ৪টি সন্তান। চার সন্তান নিয়ে খেয়ে না খেয়ে কষ্ট করে দিন কাটাতেন। এরেই মাঝে হঠাৎ কাল-বৈশাখী ঝড়ের মত ২০১৯ সালে শুরুতে বানেচা খাতুনের স্বামী লোকমান হোসেন মারা যায়। স্বামী মারা যাওয়ার পর বানেচা খাতুন দিশে হারা হয়ে পড়েন। সংসার চালাতে বাধ্য হয়ে ভিক্ষাবৃত্তিতে নেমে পড়েন, মাঝখানে বেশ কিছু সময়ের মধ্যে ছেলেরা যে যা পারে বিবাহ করে বউ নিয়ে পৃথক হয়ে যায়। এমন অবস্থায় বানেচা খাতুন কোন রকম ভিক্ষাবৃত্তি করে সংসার চালায়, হঠাৎ ২০১৯ সালে ধরা পড়ে তার চোখে ছানী, ছানী ধরা পড়ার পর ভিক্ষা করতে মহা বিপদে পড়ে, রাত হলে আরো সমস্যা বেশি হয়। হতাশার এক পর্যায়ে দেখা মিলে অত্র নারায়ণপুর গ্রামের ভার্ক এর স্বাস্থ্য পরিদর্শক কামরুন্নাহার এর সাথে, সে পরামর্শ দিলে গত ২০১৯ সালের মার্চ মাসে সমৃদ্ধি কর্মসূচি ভার্ক-এর উদ্যোগে বিনামূল্যে তার চোখের ছানী অপারেশন করা হয়। কয়েক বছর যেতে না যেতে আবার আরেকটি চোখে ধরা পড়ে ছানী। পরে আবারো ভার্ক-এর সহযোগিতায় তার চোখের ছানী অপারেশন করা হয়। এখন বর্তমানে সে অনেক ভালো। এই বিষয়ে বানেচা খাতুন জানান আমি অসহায় একজন মানুষ, আমি কোনোদিন আমার চোখের ছানী অপারেশন করতে পারতাম না। কিন্তু ভার্ক এর কারণে আল্লাহর রহমতে আমার দু'চোখ দিয়ে এখন সুন্দরভাবে চোখে দেখতে পারছি। এই জন্য যতদিন বেঁচে থাকবো ভার্ক এর জন্য দোয়া করবো।

অত্র গ্রামের মেম্বার আবুল কালাম বলেন বানেচা খাতুন একটি দরিদ্র পরিবারের মানুষ, তার জীবন অনেক কঠিন ছিলো, ছেলেরা থেকেও নাই তার চোখের ছানী অপারেশনের ফলে সে এখন সুন্দরভাবে চলাফেরা করতে পারছে। এটা অনেক ভালো একটি বিষয়, আমি ভার্ককে এই কাজের জন্য ধন্যবাদ জানাই।

ঘুরে দাঁড়িয়েছে কুলসুম

মোঃ শাহারুল ইসলাম, সমন্বয়কারী, সমৃদ্ধি কর্মসূচি, ভার্ক।

ছেলে, মেয়েদের দু বেলা দু'মুঠো ভাত দিতে পারিনি, ভালো পোশাক দিতে পারিনি, রোগ হলেও চিকিৎসা করতে পারিনি, মনে হয় আল্লাহ যেন সমস্ত কষ্ট আমার উপর চাপিয়ে দিয়েছে। সে কষ্টের মাঝে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর সপ্ন দেখছি। অশ্রুসিক্ত দুই নয়নে এমনি কষ্টের কথা জানালেন লক্ষণপুর গ্রামের উদ্যমী সদস্য কুলসুম বিবি (৪০)। কুলসুম বিবি মনোহরগঞ্জ উপজেলার লক্ষণপুর ইউনিয়নের মড়হ গ্রামের। পিতা আবুল কালাম, মাতা নূরজাহান বেগমের মেয়ে। ৩ ভাই বোনের মধ্যে তিনি হলেন দ্বিতীয়। ভাই বোনের মধ্যে সে লাজুক প্রকৃতির হওয়ায় সবাই তাকে একটু বেশি ভালোবাসতো। গত ২৮ বছর আগে তার বাবা আবুল কালাম পার্শ্ববর্তী লক্ষণপুর গ্রামের সালে আহম্মেদ এর মেঝো ছেলে আনোয়ার হোসেনের সাথে তার বিবাহ দেন। স্বামী ক্ষুদ্র কুটির শিল্প ব্যবসায়ী ছিলেন। বিবাহের ৩ বছর পর পরিবারে আসে ১ম সন্তান। বর্তমান তার ২ ছেলে ৩ মেয়ে। অভাবের সংসারে তার স্বামীর ছোট একটি ব্যবসা উপর নির্ভর করে ছেলে মেয়েদের নিয়ে কোন রকম জীবন অতিবাহিত করছিলো। হঠাৎ কাল বৈশাখের কালো ছোঁবল লন্ডভন্ড করে দিলো সাজানো সংসার, স্বামী স্ট্রোকজনিত কারনে পাড়ি জমায় পরপারে। ভাগ্যের নির্মমতায় কুলসুম বিবি ২ ছেলে ৩ মেয়ে নিয়ে চরম বিপাকে পড়ে যায়। খুব কষ্ট করে শ্বশুর বাড়িতে জীবন যাপন করতে থাকে। এমন পরিবেশে এক সময় কুলসুমের শ্বশুর ৬জন সদস্যের খাবার জোগাতে হিমসিম খেয়ে যায়। এই কঠিন বাস্তবতায় বাধ্য হয়ে তাকে নামতে হয় ভিক্ষাবৃত্তিতে। লোকলজ্জার খাতিরে সে নিজের গ্রামে মানুষের কাছে হাত পাততে না পেরে চলে যায় দূরের কোন গ্রামে। কুলসুম বিবি জানায় যখন ভিক্ষাবৃত্তি করি মনের মধ্যে অনেক কষ্ট নিয়ে মানুষের দ্বারে-দ্বারে যাই, কিছু কিছু লোক বলে তুমি তো জোয়ান আছো মানুষের বাড়িতে কাজ করে খেতে পারো না। সবাইকে বুঝানোর চেষ্টা করি। আমার ৫জন ছেলে-মেয়ে আছে কেউ বিশ্বাস করে না। কি করবো ভাবি, এরপরও ভাবি, ভিক্ষা না করলে ছেলে মেয়েরা না খেয়ে থাকবে। বাধ্য হয়ে ভিক্ষা করতে থাকি। এই অবস্থা চলতে থাকলে এক সময় ২০১৭ সালে গ্রামের মুরুব্বী ওয়ার্ড কমিটির সহসভাপতি ইউসুফ মোল্লা আমাকে ডেকে পাঠায়। সে ভার্ক-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিষয়ে আমাকে বিস্তারিত বললে, আমি দেরি না করে হ্যাঁ বলে দিই। কারণ সংসারে প্রতি মাসে আমার বাবা কিছু টাকা পয়সা দিতো যা সংসারে কিছুটা সাপোর্ট দিলেও

পরিপূর্ণভাবে চলতো না। এই অবস্থায় একটু সহযোগিতা পেলে আমার জন্য অনেক ভালো হবে। মানুষের কাছে হাত পাততে হবে না। ভিক্ষাবৃত্তি করতে হবে না। তাই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখার। বছরের শুরুতে কিছুটা সমস্যা হলেও আপনাদের প্রতিষ্ঠান থেকে ১ লক্ষ টাকার যে সম্পদ তার মধ্যে ১.৫ (দেড়) বিঘা জমি বন্ধক নিয়েছি যা থেকে প্রতি বছর আমি ২০ মণ ধান পাই। গরুটা অনেক বড় হয়েছে, এখন ৩ মাসের গাভীন। আমি কল্পনা করে থাকি গরুটির বাচ্চা হলে সেখান থেকে আমার সম্পদ বাড়বে এবং সংসার চালানোর জন্য প্রতিদিন দুধ পাবো যাতে সংসারের উন্নতি হবে। এছাড়াও আমার ১৪ জোড়া হাঁস থেকে প্রতি মাসে ১০০০-১২০০ টাকার ডিম বিক্রি করে থাকি। দোয়া করবেন, আস্তে আস্তে আমি যেন আমার কষ্টগুলো লাঘব করতে পারি। বলতে বলতে দুই চোখের ভিতরে জমে থাকা কষ্টের অশ্রু টপটপ করে পড়তে থাকে কুলসুমের। কান্নাজড়িত কণ্ঠে তিনি আরো বলেন, আমার এমন অবস্থা গেছে ছেলে-মেয়েদের একবেলা খাবার দিয়েছি, আরেক বেলা দিতে পারিনি। তাদের ছোট খাটো রোগ হলেও চিকিৎসা করাতে পারিনি। বাধ্য হয়ে গ্রামের অন্য মানুষের কাছে গিয়ে হাত পাততে হতো। এমন অবস্থা আমার জন্য বড় কষ্টের ছিলো। এই বিষয়ে গ্রামের মুরুব্বী আবুল কালাম বলেন, কুলসুম-এর জীবনটা আসলে বড় কষ্টের। তার স্বামী মারা যাওয়ার পর সে অন্যের কাছে চেয়েচিন্তে সংসার চালিয়েছে। আমরা বিভিন্ন সময়ে বাজার করে তার জন্য পাঠিয়ে দিতাম। কোন সময় গাছের কাঁঠাল, বাড়িতে থাকা খাবার ছেলে মেয়েদের ডেকে দিয়ে দিতাম। বর্তমানে সে কিছুটা স্বচ্ছল আপনাদের সহযোগিতায়। এই জন্য গ্রামবাসী ভার্কের প্রতি কৃতজ্ঞ।

ওয়ার্ড মেম্বার আনোয়ার হোসেন বলেন, কুলসুম এখন আস্তে আস্তে এগিয়ে যাচ্ছে। তার কষ্টের মাঝে কিছুটা হলেও সু-বাতাস বইছে। দুই মেয়েকে এখন সে লেখাপড়া করাচ্ছে। বড় মেয়ে ৮ম শ্রেণীতে পড়ছে, মেঝোটা ৫ম শ্রেণী, সেজো ছেলেটা ২য় শ্রেণী, আর বাকিটা ছোট। আমি প্রধান শিক্ষককে বলে বড় মেয়ের বেতন ফ্রি করে দিয়েছি। গ্রামবাসি তাদের অনেক সাহায্য করে। বর্তমানে সে এখন কিছুটা ভালো আছে।

তার শ্বশুর সালেহ আহম্মেদ বলেন, আমার ছেলেটা মারা যাওয়ার পর খুব কষ্ট করে আমরা এই নাবালক ছেলে মেয়েদের মানুষ করেছি। আমি এখন চলাফেরা করতে পারিনা। এক সময় অতিরিক্ত কাজ করে তাদের খাবার জোগিয়েছি। এখন ছেলেরা তাকে সহযোগিতা করে। আপনাদের দেওয়া জমি আবাদের জন্য পানি ছেলেরা সহযোগিতা করে উঠিয়ে দেয়। এখন কিছুটা হলেও সে ভালো আছে। তার সন্তানরা দু'বেলা খাবার খেতে পারছে। বিশেষ করে জমিটা পেয়ে খুব ভালো হয়েছে। সে এখন ঘুরে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখছে।

গবাদি পশু পালনে সফল রহিমা বেগম

মো: শাহজাহান, শাখা ব্যবস্থাপক, শিবপুর শাখা, ভার্ক, মাধবদী এরিয়া।

শিবপুর উপজেলার পূবেরগাঁও গ্রামে ১২/০১/১৯৭১ সালে রহিমা বেগমের জন্ম হয়। পিতামাতার আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না হওয়ার কারণে লেখাপড়া তিনি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত করেন। রহিমা বেগমের একই গ্রামের মোবারক খানের ছেলে আবুল কাশেম খানের সহিত বিবাহ হয়। আবুল কাশেম পেশায় ছিলেন দিন মজুর। তাদের পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৪ জন। আবুল কাশেম তার এক পার্শ্ববর্তী চাচার গরুর খামারে দিনমজুরী কাজ করতেন। যে আয় হতো তাতে তাদের সংসারে অভাব অনটন লেগে থাকত। ঠিক সেই সময় রহিমা বেগমের সাথে ভার্কের এক উন্নয়নকর্মীর পরিচয় হয়। তারা আর্থিকভাবে উন্নতি করার জন্য সিদ্ধান্ত নেন যে, তারা নিজেরাই একটি গাভী কিনবে, কিন্তু পুঁজি না থাকার কারণে তারা তা পারছিলেন না।

তিনি গত ০৩.০১.২০২১ ইং তারিখে ভার্ক শিবপুর শাখার জীবন্ত মহিলা সমিতিতে সদস্য হন এবং প্রথম দফায় গাভী পালন প্রকল্পে ১,৫০,০০০.০০ (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা ঋণ গ্রহণ করে নিজেরাই গাভী পালন শুরু করেন। গাভী পালন করে তিনি বেশ কিছু টাকা আয় করেন। তিনি ২য় দফায় ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা এবং ৩য় দফায় ২,০০,০০০.০০ (দুই লক্ষ) টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। আজ রহিমা বেগমের গরুর খামার অনেক বড় হয়েছে। খামারে এখন তার ৬টি গাভী, একজন কর্মচারি ও রহিমা বেগম নিজে কাজ করেন। তাদের খামার থেকে প্রতিদিন গড়ে ৬০ লিটার দুধ পাওয়া যায় যার বর্তমান বাজার মূল্য ৪,৮০০.০০ (চার হাজার আটশত) টাকা। খরচ বাদে তাদের আয় প্রতিমাসে প্রায় ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার) টাকা।

সদস্য রহিমা বেগম ও তার স্বামী দুইজন মিলে গাভী পালন করে তারা বেশ কিছু টাকা আয় করেছেন এবং তাদের খামার বাড়িয়েছেন। বাড়িতে একটি নলকূপ স্থাপন করেছেন ও থাকার জন্য হাফ বিল্ডিং ঘর নির্মাণ করেছেন। দিন দিন তার উন্নতি হতে শুরু করেছে। স্বামী ও সন্তানদের নিয়ে রহিমা বেগম এখন স্বাবলম্বী।

রহিমা বেগম ভবিষ্যতে ভার্ক অফিসের সঙ্গে সু-সম্পর্ক রেখে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে নিজের সামাজিক ও পারিবারিক অবস্থানকে আরও উন্নতির দিকে নিতে চান। তিনি তার এই পরিবর্তনের জন্য ভার্কের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

এসডিজি বাস্তবায়ন ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা

সূত্র: ভোরের কাগজ, ১২ এপ্রিল ২০২৩

এসডিজির এজেন্ডাগুলোকে অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং ২০২১-৪১ সাল পর্যন্ত পরিপ্রেক্ষিত পরিকল্পনার লক্ষ্যগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করে বাস্তবায়নের জন্য সরকার কাজ করছে। তবে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের চ্যালেঞ্জটি বেশ কঠিন। এসডিজি বাস্তবায়নে সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সহস্রাব্দের উন্নয়ন লক্ষ্য বাস্তবায়ন শেষে জাতিসংঘ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টসমূহ ঘোষণা করে। এতে মোট ১৭টি অভীষ্ট, ১৬৯টি লক্ষ্য ও ২৩২টি সূচক নির্ধারণ করা হয়। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের পেছনে বড় উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্যকে পরাজিত করা এবং একই সঙ্গে পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশকে সুরক্ষা দেয়া। জানা গেছে, ২০১৫ সালে শুরু হওয়া এসডিজি মহাপরিকল্পনার ইতোমধ্যে ৭ বছর পার হয়েছে; যার বাস্তবায়ন গতি কোভিড-১৯ মহামারি ও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে কিছুটা হলেও হুমকির মুখে পড়েছে। ক্ষুধা-দারিদ্র্য হ্রাসের পরিবর্তে এখন তা বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের সামনে মোটা দাগে চারটি চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এগুলো হলো-অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, সামাজিক অন্তর্ভুক্তির পরিসর বাড়ানো, স্থিতিশীল সুশাসন এবং জলবায়ু পরিবর্তনরোধ ও অভিযোজন। এই লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে দেশে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে চলছে নানা কার্যক্রম। তবে এর গতি আশানুরূপ না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে লক্ষ্যমাত্রা অর্জন নিয়ে সংশয় রয়েছে। এ কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সম্প্রতি বৈশ্বিক খাদ্য, জ্বালানি ও অর্থনৈতিক সংকটের কারণে উন্নয়নশীল দেশগুলো এসডিজি অর্জনের সব লক্ষ্যমাত্রা কার্যকরভাবে বাস্তবায়নে আরো চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। স্বল্পোন্নত দেশগুলোর অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বৈশ্বিক পর্যায়ে এসডিজি সফলভাবে বাস্তবায়নে অবকাঠামোর জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়নের ব্যবস্থা করাটা প্রকৃতপক্ষে বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। অর্থনৈতিক সূচকের দিক থেকে আমরা অনেক দূর এগিয়েছি; কিন্তু উন্নয়নকে টেকসই মনে করতে পারছি না। কারণ ঋণখেলাপির পরিমাণ বেড়েই চলছে, ক্রমেই প্রকট হচ্ছে ধনী-গরিবের আয় ও ভোগ-ব্যবধান। বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব-দ্বীপ রাষ্ট্র বাংলাদেশ, সে ক্ষেত্রে জলবায়ুর চরমভাবাপন্ন বৈরী আচরণ এবং পরিবেশের অবনমন দেশে টেকসই প্রবৃদ্ধি অর্জনে চ্যালেঞ্জ।

২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশঙ্কা রয়েছে। উত্তাপ বাড়ার কারণে হিমবাহের গলন আরো বাড়ার আশঙ্কা। হিমালয় অঞ্চলে তৈরি হবে অসংখ্য হিমবাহ লেক। এসব লেকে বিস্ফোরণ হলে মারাত্মক বিপর্যয়ের মুখে পড়বে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন, খরা, পানির স্তর নিচে নেমে যাওয়াসহ বেশ কিছু সমস্যা এসডিজির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্যানিটেশনের ক্ষেত্রেও আমাদের অগ্রগতি কম। ২০৩০ সালের মধ্যে সবার জন্য নিরাপদ পানি ও স্যানিটেশন বা পয়ঃনিষ্কাশন নিশ্চিত করতে হবে। বৈশ্বিকভাবে ৮০ শতাংশ পানি দূষিত হয়ে পরিবেশে চলে যাচ্ছে, যা একদিন ভয়াবহ আকার ধারণ করবে। পৃথিবীর ১৮ বিলিয়ন মানুষ অপরিশোধিত পানি ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। ৬৬৩ মিলিয়ন মানুষের নির্দিষ্ট কোনো পানির উৎস নেই। ঢাকায় যে পরিমাণ বর্জ্য পানি তৈরি হচ্ছে তার ৮০ শতাংশই ব্যবস্থাপনার বাইরে থেকে যাচ্ছে। যুগোপযোগী পানি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়নের পাশাপাশি পানি, জনস্বাস্থ্য ও পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থাপনার সঙ্গে সম্পৃক্ত সংস্থা বা সরকারি বিভাগগুলোর সমন্বয়ও বিশেষ প্রয়োজন। আমরা আশা করব, সরকারের নীতিনির্ধারকরা এসব বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেবেন।

"ডেঙ্গু" আতংক নয় সচেতনতা ও প্রতিরোধই প্রতিকার

রোগ পরিচিতি:

ডেঙ্গু এডিস মশা বাহিত একটি সংক্রামক রোগ। আমাদের দেশে বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষিপ্তভাবে এ রোগের প্রভাব দেখা যায়। যে কোন বয়সের মানুষ এ রোগে আক্রান্ত হতে পারে। এডিস জাতীয় মশার কামড়েই ডেঙ্গু জ্বর হয়। প্রাথমিকভাবে শনাক্ত হলে এ রোগ সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং চিকিৎসায় সেরে যায়। কিন্তু মারাত্মক হেমোরেজিক হলে এবং যথাযথ চিকিৎসা না হলে রোগীর মৃত্যু হতে পারে।

এডিস মশা চেনার উপায়

→ এডিস মশা দেখতে অনেকটা কিউলেক্স মশার মতো তবে গায়ে ডোরা কাটা দাগ আছে।

→ এডিস মশা আলো-আঁধারিতে (সকাল-সন্ধ্যা) কামড়ায়।

→ এ মশা স্বচ্ছ পানিতে থাকতে ভালোবাসে। ফুলের টব, ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল, কলস, গাড়ীর পরিত্যক্ত টায়ার, কৌটা, নারিকেল বা তাদের খোসা ইত্যাদি যেখানে স্বচ্ছ পানি থাকে সেখানে এডিস মশা বংশ বৃদ্ধি করে।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

→ শরীরে তাপমাত্রা হঠাৎ করে ১০৪ থেকে ১০৫ ডিগ্রী বৃদ্ধি পায়।

→ মাথা ব্যথা, মাংসপেশী, চোখের পেছনে, পেটে ব্যথা এবং হাঁড়ে বিশেষ করে মেরুদণ্ডে ব্যথা।

→ অরুচি, বমি বমি ভাব ও বমি করা।

→ চামড়ার নিচে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্তক্ষরণ, চোখে রক্ত জমাট বাঁধা।

→ লালচে/কালো রঙের পায়খানা, দাঁতের মাড়ি, নাক মুখ ও পায়খানার রাস্তা দিয়ে রক্তপাত।

→ রক্তচাপ হ্রাস, নাড়ীর গতি দ্রুত হওয়া, ছটফট করা, শরীর ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট বা অজ্ঞান হয়ে পড়া।

→ শরীরে হামের মতো দানা দেখা দিতে পারে।

→ মারাত্মক (হেমোরেজিক) ডেঙ্গুজ্বরের ক্ষেত্রে শরীরের অন্তঃস্থিত বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে রক্তক্ষরণ এবং পেটে ও ফুসফুসে পানি জমতে পারে।

ডেঙ্গু জ্বরের চিকিৎসা

→ সাধারণত ডেঙ্গু জ্বর হলে ৭ দিনেই ভালো হয়ে যায় এবং এ সময় সম্পূর্ণ বিশ্রাম প্রয়োজন।

→ মারাত্মক (হেমোরেজিক) ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্তের চিকিৎসার ক্ষেত্রে রোগীর পানির স্বল্পতা (Dehydration) এবং রক্তক্ষরণের চিকিৎসার জন্য আইডি স্যালাইন বা রক্ত সঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে।

→ খাবার স্যালাইন এবং সাথে তরল খাদ্য খাওয়াতে হবে।

রক্তক্ষরণ বা রক্ত বমি হলে বা পায়খানার সাথে রক্ত পড়লে বা রক্তচাপ কমে গেলে বা পেট ব্যথা হলে ও পেট ফুলে গেলে

→ যতদ্রুত সম্ভব হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে অথবা অভিজ্ঞ ডাক্তারের সাথে যোগাযোগ করতে হবে।

→ রক্ত পরীক্ষা করতে হবে।

→ ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হলে গায়ে ব্যথার জন্য অ্যাসপিরিন, ক্লোফেনাক, আইবুপ্রোফেন-জাতীয় ওষুধ খাওয়া যাবে না। ডেঙ্গুর সময় এ-জাতীয় ওষুধ গ্রহণ করলে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

ডেঙ্গু প্রতিরোধের উপায়:

→ ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, ভাঙ্গা হাঁড়ি-পাতিল, টিনের কৌটা, গাড়ির পরিত্যক্ত টায়ার, ভাঙ্গা কলস, ড্রাম, নারিকেল ও ডাবের খোসা, ফাস্টফুডের কন্টেইনার, এয়ারকন্ডিশনার, রেফ্রিজারেটরের তলায় পানি জমতে দেবেন না। যে সব স্থানে মশা জন্মায়-সেইসব স্থানে পানি জমতে দিবেন না, বাড়ির ভেতর, আশ-পাশ ও আঙিনা পরিষ্কার রাখুন। দিনে অথবা রাতে ঘুমানোর সময় মশারী ব্যবহার করুন।

ডেঙ্গু জ্বর সনাক্তকরণ ও চিকিৎসার কতিপয় সেবা কেন্দ্রের পরিচিতি

→ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সাভার, ঢাকা

→ আমিন বাজার ২০ শয্যা হাসপাতাল

→ পিজি হাসপাতাল

→ ঢাকা শিশু হাসপাতাল

→ সোহরাওয়ার্দী হাসপাতাল

→ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

→ সরকারি কর্মচারী হাসপাতাল

→ ঢাকা সিটি কর্পোরেশন মহানগর হাসপাতাল

→ হলি ফ্যামিলি হাসপাতাল ও এর ৯টি ন্যাশনাল ডায়াগনস্টিক নেটওয়ার্কভুক্ত প্রতিষ্ঠান

→ ঢাকাসহ প্রতিটি বিভাগীয় মেডিক্যাল কলেজ ও সদর হাসপাতাল।

একজন ডিমেনশিয়ার বন্ধু হন

দেশের বয়স্ক জনগোষ্ঠির একটি অংশ ডিমেনশিয়া নামক ভয়াবহ মস্তিষ্ক রোগে আক্রান্ত। আমাদের দেশের খুব অল্প সংখ্যক মানুষ এ রোগটি সম্পর্কে জানেন। ডিমেনশিয়া সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত থাকায় এ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের লক্ষণগুলো ও সঠিক পরিচর্যা সম্পর্কে আমরা জ্ঞাত নই। আমাদের অজ্ঞতার কারণে আক্রান্ত ব্যক্তিরা অযত্ন-অবহেলায় অতি কষ্টে জীবন-যাপন করছেন, অথচ তাদের সঠিক সেবা-যত্ন প্রাপ্য।

আমাদের দেশে ডিমেনশিয়া সচেতনতা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু - বান্ধবরা প্রায়ই উপেক্ষা করেন এবং ভুলক্রমে এটাকে বার্ধক্যজনিত অথবা বয়োবৃদ্ধির একটি স্বাভাবিক অংশ হিসেবে উল্লেখ করতে চান। ডিমেনশিয়া বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক কোন অংশ নয়, ডিমেনশিয়া মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ। এখন পর্যন্ত ডিমেনশিয়ার ভালো কোনো চিকিৎসা ব্যবস্থা আবিষ্কৃত হয়নি।

বিশ্বব্যাপী মানুষের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির ফলে বয়স্ক লোকের সংখ্যাও দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ডিমেনশিয়া আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা। এক্ষেত্রে বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। ২০১৫ সালে বাংলাদেশে অনুমতি ডিমেনশিয়া রোগীর সংখ্যা ছিল ৪ লক্ষ ৬০ হাজার এবং ২০৩০ সালে তা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াবে ৮ লক্ষ ৩৪ হাজার এবং ২০৫০ সালে সেটা হবে ২১ লক্ষ ৯৩ হাজার।

বিশ্বে প্রতি ৩ সেকেন্ডে একজন করে মানুষ নতুন ভাবে ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। বর্তমানে বিশ্বে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ মানুষ ডিমেনশিয়া আক্রান্ত হয়েছে, যার প্রায় ৬২ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বসবাস করে এবং ১৩ কোটি হবে ২০৫০ সালে যার ৬৮ শতাংশই নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোতে বসবাস করবে। ফলে ডিমেনশিয়া একবিংশ শতাব্দির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য ও সামাজিক সংকট হিসেবে দেখা দিতে পারে। তাই দ্রুত ডিমেনশিয়া মোকাবেলার জন্য জাতীয় পরিকল্পনা গ্রহণ করা উচিৎ বলে আমরা মনে করি।

আসুন, আর কালক্ষেপণ না করে সবাই মিলে ডিমেনশিয়ার বন্ধু হওয়ার প্রচারণায় অংশগ্রহণ করি এবং ডিমেনশিয়া মোকাবিলায় সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তি এবং তাঁদের সেবাদানকারীর পাশে দাঁড়াই।

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ কি?

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ একটি একক রোগ নয়। ডিমেনশিয়া শব্দের মাধ্যমে মস্তিষ্কের একগুচ্ছ রোগ লক্ষণের বিবরণ দেয়া হয় যার ভেতরে আছে স্মৃতিশক্তি লোপ পাওয়া, ভাষা এবং যুক্তির ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দেয়া, মেজাজ ও আচরণে পরিবর্তন আসা, সামাজিক কর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া। ব্যক্তি বিশেষে ডিমেনশিয়ার প্রাথমিক রূপ ভিন্ন হলেও সর্বশেষ অবস্থায় আক্রান্ত ব্যক্তিগণ নিজের শারীরিক যত্ন নিজেরা করতে পারেন না এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে পরনির্ভরশীল হয়ে পরেন। পায়খানা, প্রশ্রাবসহ সকল কাজে অন্যের সাহায্য প্রয়োজন হয়। আর তাকে হয়তো সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায় না, তবে গুণগত সেবা-যত্ন পেলে ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগ নিয়েও একজন মানুষ ভালোভাবে বেঁচে থাকতে পারেন।

কারা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হয়?

সাধারণত বয়স্ক লোকেরা ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত হয় এবং বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে এর প্রবণতা বাড়ে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ৬০ বছরের উর্ধ্বে এবং কদাচিৎ এটি অল্পবয়সীদের (৪০-৫০ বছর) ওপর প্রভাব ফেলে। ডিমেনশিয়া বয়োবৃদ্ধির স্বাভাবিক কোনো অংশ নয়, ডিমেনশিয়া মস্তিষ্কের ক্ষয়জনিত রোগ। বয়স্ক লোকদের সাধারণত বয়স সংক্রান্ত স্মৃতি দুর্বলতা হয় তা থেকে ডিমেনশিয়া ভিন্নতর। ডিমেনশিয়া রোগ এমন নয় যে বার্ধক্যের জন্য বা বেশি বয়স হলে এটা হবেই কিংবা এমনও নয় যে সব লোকেরই ডিমেনশিয়া হবে। ডিমেনশিয়া সমাজের সকল গ্রুপকেই সমানে আক্রমণ করে। এটা সমাজের কোন শ্রেণী, জেন্ডার, জাতিগত-নৃ-গোষ্ঠী অথবা ভৌগোলিক অবস্থানের উপর নির্ভর করে না।

ডিমেনশিয়ার কারণ

ডিমেনশিয়া বিভিন্ন রোগের সাথে সম্পর্কিত যেমন - ব্রেইন স্ট্রোক, হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেস্টোরেল, ব্রেইন ইনজুরী, আলঝেইমারস্ রোগ, অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস, এইডস, থাইরয়েডের সমস্যা, দীর্ঘমেয়াদী ধূমপান বা মদ্যপান, শরীরের ভিটামিন বা খনিজ উপাদানের ঘাটতি, ভিটামিন বি-এর অভাব, কার্বন-মনোক্সাইড বিষক্রিয়া, মস্তিষ্কের রক্ত চলাচল কমে যাওয়া ইত্যাদি।

ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগের প্রকার

বহু রকমের ডিমেনশিয়া রোগ আছে। অতি পরিচিত কিছু প্রকারের ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রোগ নিয়ে নিচে

আলোচনা করা হলো। ডিমেনশিয়ার প্রকারভেদে রোগের উপসর্গগুলোও ভিন্ন ভিন্ন হবে।

আলঝেইমারস্ রোগ

ডিমেনশিয়ার সবচাইতে বড় কারণ হচ্ছে আলঝেইমারস্ রোগ, যা শতকরা ৬৫ ভাগের ক্ষেত্রেই ডিমেনশিয়ার জন্য দায়ী। এটা মস্তিষ্কের বিভিন্ন কোষ ও স্নায়ুতন্ত্রকে ধ্বংস করে তথ্য প্রবাহের মেসেজবাহী ট্রান্সমিটারের প্রবাহকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। বিশেষত: স্মৃতি গ্রহণ সঞ্চয় ও রক্ষণ কাজে সংশ্লিষ্ট স্নায়ুকোষসমূহ এ রোগে অধিক আক্রান্ত হয়।

ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া

মস্তিষ্ক একটি অক্সিজেন যুক্ত রক্ত সরবরাহকারী ভেসেলস নেটওয়ার্কের উপর নির্ভরশীল। মস্তিষ্কে অক্সিজেন সরবরাহ বন্ধ হয়ে গেলে মস্তিষ্কের কোষগুলো মারা যায় এবং এর দ্বারা ভাস্কুলার ডিমেনশিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পায়। হঠাৎ করেই ডিমেনশিয়ার লক্ষণ দেখা দিতে পারে কিংবা কোন একটা বড় স্ট্রোক বা ক্রমান্বয়ে ঘটে যাওয়া অনেকগুলো ছোট ছোট স্ট্রোকের ফলে ডিমেনশিয়ার লক্ষণ ধীরে ধীরে দেখা দিতে পারে।

মিক্সড বা মিশ্র ডিমেনশিয়া

এটি হচ্ছে যার আলঝেইমারস্ রোগ ও ভাস্কুলার ডিমেনশিয়া দুটোই আছে। আর এক্ষেত্রে উপরোল্লেখিত উভয় প্রকার ডিমেনশিয়ার লক্ষণই পরিলক্ষিত হতে পারে রোগীর মাঝে।

লিউয়ি বডি ডিমেনশিয়া

এ জাতীয় ডিমেনশিয়ায় স্নায়ু কোষের ভিতরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোলাকার বস্তু (লিউয়ি বডি) জমে বিধায় একে লিউয়ি বডি ডিমেনশিয়া বলা হয়। ব্রেনে এগুলির উপস্থিতি মস্তিষ্কের টিস্যুর ক্ষয় রোগ (ডিজেনারেশন) সৃষ্টি করে। স্মৃতিশক্তি, একাগ্রতা এবং ভাষা-দক্ষতা এতে নষ্ট হয়ে যায়।

ফ্রন্টো-টেম্পোরাল ডিমেনশিয়া

ফ্রন্টো-টেম্পেরাল ডিমেনশিয়ার সাধারণত মস্তিষ্কের সামনের অংশও কিছু কিছু সময় পার্শ্বের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যক্তিত্ব এবং আচরণগত দিকগুলি এতে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সে তুলনায় স্মৃতি শক্তির বিপর্যয় অপেক্ষাকৃত কম থাকে।

ডিমেনশিয়ার লক্ষণ ও উপসর্গগুলি

ভুলে যাওয়া বার্ধক্যের সাধারণ একটি অংশ এবং এই সাধারণ ভুলে যাওয়া আলঝেইমারস্ বা ডিমেনশিয়ার লক্ষণ নয়। এই রোগকে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ব্যবহৃত সঠিক মাপকাঠি দিয়ে নির্ণয় করা হয়। তবে সাধারণত একজন ডিমেনশিয়া রোগীর নিম্নলিখিত অসুবিধাগুলির কিছু বা সবগুলো হতে পারে।

১. **স্মৃতিশক্তি হ্রাস**
এই রোগের প্রথম একটি লক্ষণ হলো, স্মৃতি শক্তি লোপ পাওয়া। এটি শর্ট-টার্ম মেমোরি বা স্বল্পমেয়াদে স্মৃতি-বিভ্রাট ঘটাতে পারে। আক্রান্ত ব্যক্তি অল্প কিছুক্ষণ আগের কোন ঘটনা বা কারো সাথে তার কথোপকথন ভুলে যেতে পারেন। তার চেনা মানুষের নাম বা চেহারা ভুলে যেতে পারেন। এমন কি অনেক সময় পরিবারের খুব কাছের সদস্যদেরও চিনতে পারেন না।

২. **পরিকল্পনা বা সমস্যা সমাধানে অপারগতা**
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি কোন পরিকল্পনা সঠিক ভাবে অনুসরণ করতে বা গাণিতিক সমস্যা সমাধানে সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন। যেমন - তাঁরা হয়তো আর আগের মত সঠিক ভাবে মাসিক খরচের হিসাব রাখতে পারেন না কারণ তারা সাধারণ যোগ-বিয়োগ ভুল করতে পারেন।

৩. **প্রতিদিনের চেনাকাজ সম্পূর্ণ করতে কষ্ট হওয়া**
প্রতিদিনের স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে সমস্যায় পড়তে পারেন যেমন, চেক বই সঠিকভাবে লিখতে না পারা, পছন্দের কোন রান্না করতে গিয়ে কি কি দিয়ে রান্নাটি করতে হয় তা ভুলে যাওয়া, ফোন ব্যবহারে সমস্যা কিংবা ওষুধ খেতে ভুলে যাওয়া এমনকি প্রতিদিনের জামা কাপড় কিভাবে পড়তে হয় তাও ভুলে যেতে পারেন।

৪. **স্পষ্টভাবে বাড়ির রাস্তা বা ঠিকানা বলতে না পারা**
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তি সঠিকভাবে দিন, তারিখ, মাস ও সময় বলতে পারেন না। পথের মধ্যে হারিয়ে যেতে পারেন বা রাস্তা ভুল করে অন্য ঠিকানায় চলে যেতে পারেন। অনেক পরিচিত কোন জায়গার নাম ভুলে যেতে পারেন, এমনকি সেটা নিজের বাড়ির রাস্তা বা ঠিকানাও হতে পারে।

৫. **রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যাল বা রাস্তার দূরত্ব নির্ণয় সমস্যা**
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে বিশেষ ধরনের চিহ্ন বা ছবি সনাক্ত করতে কষ্ট হতে পারে। যেমন, রাস্তার ট্রাফিক সিগন্যালে ব্যবহৃত লাল বা সবুজ রঙ চিনতে সমস্যা হতে পারে; যা তাদের একাকী রাস্তায় চলাচলের সময় অনেক বিপদে ফেলতে পারে।

৬. **গুছিয়ে কথা বলতে বা লিখতে সমস্যা**
তাদের কথা এবং ভাষা সমস্যা তৈরি হতে পারে। সঠিক শব্দ খুঁজে পেতেও তাদের অসুবিধা পড়তে হয়। শিশুদের মত এলোমেলো করে বাক্য বলা যা অনেক সময় বোধগম্য হয় না। লেখার সময় অক্ষর ভুলে যাওয়া যেমন, আমি সব ভুলে যাই এর বদলে আনি সর ভুলে যায় লিখে বসে। এছাড়াও কথোপকথোনের ঠিক মাঝখানে শব্দ ভুলে যাওয়া বা সম্পূর্ন বাক্য বলতে না পারা তখন তারা আমতা-আমতা করতে থাকে বা একই কথা বারবার বলতে থাকে।

৭. **সঠিক জায়গায় জিনিসপত্র না রাখা**
নিত্য প্রয়োজনীয় কোন একটা জিনিস সঠিক জায়গায় না রেখে ভুল জায়গায় রাখতে পারেন যেমন, আলমারীর চাবি হয়তো চিনির বয়ামে রেখেছেন অথবা ভুল করে ফ্রিজে কাপড় বা মোবাইল ফোন রাখতে পারেন।

৮. **বিচার - বিবেচনা ক্ষমতা কমে যাওয়া**
ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত ব্যক্তির বিচার-বিবেচনা শক্তি কমে যেতে পারে। যেমন - কারো সাথে টাকা লেনদেনের সময় কম বা বেশি টাকা দিয়ে দিতে পারেন। আবার দেখা যায়, হয়তো শীতের দিনে শীতের কাপড় না পারে পাতলা বা হালকা জামা কাপড় পরিধান করেন। নিজেকে পরিস্কার রাখার ব্যাপারেও তাদের উদাসীন হতে দেখা যেতে পারে।

৯. **কাজকর্ম বা সামাজিকতায় আগ্রহ হারিয়ে ফেলা**
তাঁরা সহজেই বিরক্ত হতে পারেন, প্রায়ই হতাশায় ডুবে যেতে পারেন এবং আত্ম বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে পারেন। এর ফলে দৈনন্দিন কাজে আগ্রহ হারিয়ে ফেলতে পারেন এবং নতুন কোনও কাজ শুরুর ক্ষেত্রেও দ্বিধায় পরেন। প্রিয়জনের সাথে কোন অনুষ্ঠানে না যাওয়া, পরিবারের লোকজনের সাথে উঠা বসা না করা এমনকি প্রিয় খেলাধুলা করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন।

১০. **মেজাজ ও ব্যক্তিত্ববোধের পরিবর্তন**
স্বাভাবিক ভাবেই বয়সের সাথে সাথে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন আসে, তবে ডিমেনশিয়ায় ভুগছেন এমন ব্যক্তির ক্ষেত্রে তা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি হয়ে থাকে। যেমন - মাঝে মাঝে তাঁরা অন্যকে চুরির অপবাদ দিতে পারেন অথবা সন্দেহ করতে পারেন। যে কোন বিষয়ে খুব সহজেই চিন্তিত হয়ে পড়তে পারেন, খিটখিট মেজাজ দেখানো বা রাগান্বিত হতে পারেন এমনকি সহজে ভয়ও পেতে পারেন।

কিভাবে আপনার ডিমেনশিয়া হবার ঝুঁকি কমাতে পারেন

আপনি এমন অনেক কিছুই করতে পারেন যা আপনার ডিমেনশিয়া হবার ঝুঁকি কমিয়ে দিতে পারে, যেমন জীবন-যাপনে কিছু পরিবর্তন আনা, খাবার গ্রহণে সচেতন হওয়া, এবং নিয়মিত ব্যায়াম করা। উল্লেখ্য যে এই বিষয়গুলো শুধু ডিমেনশিয়া বা স্মৃতিভ্রংশ রাগ নয়, আরও কিছু অসুখ যেমন ডায়বেটিস, ক্যান্সার, স্ট্রোক, হৃদরোগ এসব হবার ঝুঁকিও কমিয়ে আনবে। আপনার মস্তিষ্ককে সুস্থ্য রাখতে এবং ডিমেনশিয়ার ঝুঁকি কমাতে ৫টি সহজ ধাপ আপনাকে মনে রাখতে হবে যা নিম্নরূপ:

আপনার হৃদপিন্ডের যত্ননিন
যা হৃদপিন্ডের জন্য ভালো তা মস্তিষ্কের জন্য ও ভালো। উচ্চ রক্তচাপ, উচ্চ কোলেষ্টরল ও ডায়বেটিস নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে, স্থুলতা বেশি (মোটা) কমাতে হবে এবং নিয়মিত ওজন চেক করতে হবে। ধুমপান, মদ্যপান কিংবা যে কোনো তামাকজাত দ্রব্য বর্জন করতে হবে। নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করুন এবং স্বাস্থ্য পেশাজীবীর পরামর্শ মেনে চুলন।

স্বাস্থ্যকর খাবার গ্রহণ
তাজা শাকসবজি, ফলমূল, অলিভওয়েল, মাছ, কম ফ্যাটযুক্ত দুধ, দই ও পনির এবং কম চর্বিযুক্ত মাংস খেতে হবে। এ ছাড়াও বিস্কিট, কেক ও পেষ্ট্রি কেক, যেগুলোতে ট্রান্সফ্যাট থাকে এই জাতীয় খাবার পরিহার করতে হবে।

বুদ্ধিচর্চা করুন
নানা রকম বৈচিত্রময় কাজে মস্তিষ্ককে ব্যস্ত রাখা যেতে পারে। যেমন- অবসরে পত্রিকা পড়া, আবার বুদ্ধির খেলা যেমন - শব্দভেদ (ক্রসওয়ার্ড পাজল) মেলানো, ক্যারাম বোর্ড, তাস, লুডু, দাবা খেলা, ধাঁধার সমাধান ও নতুন কোন ভাষা শেখা ইত্যাদি।

সামাজিক কর্মকান্ডগুলো উপভোগ করুন
মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে সামাজিক অনুষ্ঠানগুলো উপভোগ করুন এর দ্বারা মস্তিষ্কের নিষ্ক্রিয় অংশ সক্রিয় হতে পারে। যার ফলে ডিমেনশিয়া ও অবসাদ (ডিপ্রেসন) এর দ্বারা ঝুঁকি কমে যায়। সবার সাথে মিশতে হবে, অন্যদের খোঁজ খবর রাখা এবং নানা রকম সামাজিক কাজে নিজেকে সম্পৃক্ত করতে হবে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বন্ধু ও স্বজনদের সঙ্গে আরও বেশি সময় কাটাতে হবে।

শারীরিক পরিশ্রম করুন
নিয়মিতভাবে শারীরিক পরিশ্রম মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি করে যা মস্তিষ্কে আন্তঃ কোষের সংযোগ ঘটায়। কর্মঠ থাকাটা আপনার শরীর ও হৃদপিণ্ড উভয়ের জন্য ভালো। নিয়মিত ব্যয়াম করুন। মনে রাখুন, যে কোন নতুন ব্যয়াম শুরুর আগে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেয়া উচিৎ। পাশাপাশি প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্রাম ও পর্যাপ্ত ঘুমের দিকে খেয়াল রাখুন, কারণ এগুলো মস্তিষ্ক সুস্থ রাখতে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ফলপ্রসূ কার্যক্রম: ডিমেনশিয়া আক্রান্ত ব্যক্তিদের নীচের কাজে উৎসাহিত করুন।

- গানশোনা
- ছবি আঁকা বা সহজ নকশায় সুতার কাজ
- অফিস বা গৃহস্থালীয় বিভিন্ন কাজে আগ্রহ থাকলে সেগুলোর অংশ গ্রহণে উৎসাহিত করা
- ঘর-বাড়ি পরিস্কার - পরিছন্নতা বা গুছানোর কাজ, যেমন ঝাড়ু দেওয়া, খাবার টেবিল মুছা, জামা-কাপড় ভাঁজ করা ইত্যাদি

- বাড়ির বাগান থাকলে সেটা পরিচর্যার কাজ বা নতুন বাগান তৈরিতে উৎসাহিত করা
- তাঁকে দৈনিক সংবাদপত্র পড়তে দিন
- তাঁর পছন্দের বইগুলো পড়তে উৎসাহিত করুন
- তার পছন্দের রান্নাগুলো করতে উৎসাহ দিন বা আপনার রান্নার সহযোগী করে নিন
- তাঁর সাথে বুদ্ধিদীপ্ত খেলা যেমন, পাজল/ক্যারাম বোর্ড/তাস বা তার পছন্দের খেলা খেলে কিছু সময় কাটান এবং
- পরিবারের পুরনো ভিডিও বা ছবি দেখান অথবা তার পুরাতন স্মৃতি বিজড়িত জায়গায় নিয়ে যেতে পারেন।

নমনীয়, সহনশীল এবং সহায়তাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করুন।

তিনি যদি কোন কাজ করতে অনিচ্ছুক হন তবে বিরতি নিয়ে কিছু সময় পরে কাজটি করতে উৎসাহিত করতে পারেন। কাজটি সম্পর্কে তার মতামত যেমন কিভাবে কাজটি আরো আনন্দদায়ক করা যেতে পারে বা কিভাবে কাজটি করলে তিনি খুশি হবেন এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলা যেতে পারে। ফলাফল নিয়ে না ভেবে শুধু কাজটাতে মনোযোগ ধরে রাখার বিষয়টিতে গুরুত্ব দিতে হবে। এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না যে তিনি পাজল বা ধাঁধাটি মেলাতে পারলেন কিনা, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এইটা যে আপনার ভালোবাসার মানুষটি কোন একটি কাজের উপর সময় ব্যয় করছেন এবং ক্রমে এটাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন।

ডিমেনশিয়া বিষয়ে নিম্নের ৫টি বার্তা সবার জানা প্রয়োজন।

১. ডিমেনশিয়া স্বাভাবিক বয়স বাড়ার অংশ নয়।
২. ডিমেনশিয়া মস্তিষ্কের রোগ দ্বারা সৃষ্ট।
৩. ডিমেনশিয়া বলতে আপনার স্মৃতি হারানো বুঝায় না।
৪. ডিমেনশিয়া নিয়ে ভালোভাবে জীবন-যাপন করা সম্ভব।
৫. ডিমেনশিয়ার চাইতে বরং আক্রান্ত ব্যক্তিকে নিয়ে অনেক কিছু করার আছে।

সূত্র: আলঝেইমার সোসাইটি অব বাংলাদেশ, দেওগাঁও, সালান্দর, ঠাকুরগাঁও।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ইতিহাস

আমরা জানি, প্রতিবছর ৫ই জুন 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' পালন করা হয়। পরিবেশ রক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতার লক্ষ্যে নানা রাজনৈতিক কর্মোদ্যোগ এবং জনসচেতনতার মাধ্যমে সারা বিশ্বজুড়ে এই দিবস পালন করা হয়। আসলে ষাটের দশকে পরিবেশ দূষণ ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। অনিয়ন্ত্রিত শিল্পায়নের ফলে বায়ু, জল, মাটি সবকিছুই দূষিত হয়ে উঠেছিল। তখন থেকেই পরিবেশ সচেতনতা তৈরি হয় আর সেই সচেতনতার ফসল হিসেবে আমরা পৃথিবী ও পরিবেশ বাঁচানোর লক্ষ্যে বছরে দুটি দিবস লাভ করি। একটি হল 'বিশ্ব ধরিত্রী দিবস (Earth Day)' যা পালিত হয় ২২শে এপ্রিলে এবং অপরটি 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস (World Environment Day)' যা পালিত হয় ৫ই জুনে। আসুন এই লেখায় সংক্ষেপে জেনে নিই বিশ্ব পরিবেশ দিবসের ইতিহাস।

মূল ঘটনাটি ঘটেছিল পঞ্চাশ বছরেরও আগে। সুইডেন একটি বিজ্ঞান মনস্ক দেশ। জগৎ বিখ্যাত বিজ্ঞান সংস্থা 'রয়েল সুইডিশ একাডেমি অফ সায়েন্সেস' এখানেই অবস্থিত। তা সে দেশের সরকার ১৯৬৮ সালের ২০শে মে জাতিসংঘের অর্থনীতি ও সামাজিক পরিষদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি লিখে। চিঠিটিতে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে সুইডেন সরকার গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে। এই চিঠি পেয়ে সেই বছরেই জাতিসংঘ পরিবেশ রক্ষার বিষয়টি তাদের সাধারণ অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করে। এর কয়েক বছর পর, যে দেশটি জাতিসংঘে প্রকৃতি ও পরিবেশ দূষণ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি পাঠিয়েছিল সেই সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে ১৯৭২ সালের ৫ই জুন থেকে ১৬ই জুন পর্যন্ত জাতিসংঘ মানবিক পরিবেশ সম্মেলন (United Nations Conference on the Human Environment) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘের সমস্ত সদস্যরাষ্ট্রগুলির অনুমতি নিয়েই করা হয়েছিল। পরিবেশ রক্ষা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা এবং পরিবেশ দূষণ সহ প্রকৃতি ও পরিবেশের নানান সমস্যার সমাধান বের করার উদ্দেশ্যে এই অনুষ্ঠানটি জাতিসংঘের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত করা হয়। এই অনুষ্ঠান বা সম্মেলনটি বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম পরিবেশ-বিষয়ক আর্ন্তজাতিক সম্মেলন হিসেবে স্বীকৃতি পায়। ১৯৭৩ সালে উল্লেখিত সম্মেলনের প্রথম দিন অর্থাৎ ৫ই জুনকে জাতিসংঘ 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। এর এক বছর পর অর্থাৎ ১৯৭৪ সাল থেকে

প্রতি বছর এই দিবসটি সারা বিশ্বজুড়ে 'বিশ্ব পরিবেশ দিবস' হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রতিবছরই এই দিবসটি আলাদা আলাদা শহরে আলাদা আলাদা প্রতিপাদ্য বিষয় বা থিম নিয়ে পালন করা হয়। যেমন ১৯৭৪ সালের প্রথম বিশ্ব পরিবেশ দিবস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের স্পোকেন শহরে পালিত হয় যার থিম ছিল 'Only One Earth during Expo '74'। পরের বছর অর্থাৎ ১৯৭৫ সালে 'Human Settlements' থিম নিয়ে এই দিবসটি পালন করা হয় বাংলাদেশের ঢাকায়। এভাবেই, ২০১৮ সালে 'Beat Plastic Pollution' থিম নিয়ে আমাদের দেশের রাজধানী নিউ দিল্লিতে ও ২০১৯ সালে চীন দেশে 'Air Pollution' থিম নিয়ে বিশ্ব পরিবেশ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই ছিল বিশ্ব পরিবেশ দিবসের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এই দিবসটিকে মাথায় রেখে পরিবেশ রক্ষা করতে বেশ কিছু কাজ আমরা করতে পারি যেমনঃ-

১) প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাতে পারি এবং গাছ লাগানোয় অন্যকে উৎসাহিত করতে পারি। কেউ যেন অযথা গাছ না কাটে সেই ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা উচিত।

২) গাড়ি থেকে ক্ষতিকারক কালো ধোঁয়া বন্ধ রাখার চেষ্টা আমরা সকলেই করতে পারি।

৩) বাড়ীর ফ্রিজটিকে সময় মতো সার্ভিসিং করা দরকার।

৪) ময়লা ও আবর্জনা যেখানে সেখানে যেন না ফেলি। বর্জ্য পদার্থ, ময়লা ও আবর্জনা যেখানে ফেলার কথা সেখানেই যেন কেবলমাত্র ফেলি সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।

৫) জল অপচয় বন্ধ করা দরকার, যেখানে জল অপচয় হচ্ছে দেখা যাবে সেখানেই এই জল অপচয় বন্ধ রাখার চেষ্টা করতে হবে।

৬) পাহাড় কাটা বন্ধ রাখতে হবে।

৭) প্রাকৃতিক সম্পদ যেন অযথা নষ্ট না হয় সে ব্যাপারে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

৮) কাগজ নষ্ট কম করতে হবে। 'পেপার রি-সাইক্লিং' করা দরকার।

৯) প্লাষ্টিকের ব্যবহার যতটা সম্ভব কম করা যায় ততটা কম করতে হবে।

১০) জ্বালানি নয়, বিকল্প শক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন।

সূত্রঃhttps://storymirror.com/read/bengali/story/bishb-pribesh-dibser-itihaas/5dgmf1x4.

পুরানো দিনের স্মৃতি

অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় ভিইআরসি'র ভূমিকা

শেখ আবদুল হালিম

স্বাবলম্বী: ৯ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর, ১৯৮৬

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে অনানুষ্ঠানিক পদ্ধতির ব্যবহার করেছেন স্বেচছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা। দেশের অগণিত নিরক্ষরদের কাছে সাক্ষরতার আলো পৌঁছে দেবার মহান দায়িত্ব নিয়ে এইসব সংগঠন ক্রমশঃ নিজস্ব কর্মসূচী এলাকায় সাফল্য অর্জন করে চলেছে। এই প্রতিবেদনে পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষা কেন্দ্র (ভি,ই,আর,সি) এর অভিজ্ঞতার কথা বলা হয়েছে-যারা নিজস্ব পদ্ধতি অবলম্বন করে উন্নয়ন কর্মসূচী পরিচালনা করছে।

আজ একথা সর্বজনবিদিত যে, নিরক্ষরতা প্রত্যেক জাতির জন্য অভিশাপ, উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। ব্যক্তি, পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে নিরক্ষরতা একটি মৌলিক সমস্যা। অস্বাস্থ্য, অজ্ঞতা, দারিদ্র ও অশান্তির একটি বড় কারণ হলো জনগণের অজ্ঞতা ও অশিক্ষা। এই জন্য নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে যুগে যুগে, দেশে-বিদেশে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে, অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে এবং নিরক্ষরতা দূরীকরণের কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। অনেক দেশে সাফল্য এসেছে আবার অনেক দেশে বিফলতারও নিদর্শন রয়েছে।

দু:খজনক হলেও এটা সত্য যে, আমাদের দেশ এক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে থাকা কাতারের শামিল। পরাধীনতার আমলে বিষয়টি তেমন প্রশাসনিক গুরুত্ব পায়নি। নিরবিচ্ছিন্নভাবে কোন সার্বিক ও সমন্বিত সরকারী বা বেসরকারী উদ্যোগ পরিচালিত হয়নি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর, বিভিন্ন স্বেচছাসেবী সংগঠন তাদের গ্রাম উন্নয়ন ও সমাজ উন্নয়নমূলক কর্মসূচী শুরু করে। উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে এসব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের কর্মীরা নিরক্ষরতাকে প্রধানতম সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করেন। ফলে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্নভাবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ শুরু করে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে পল্লী সম্পদ ব্যবহার শিক্ষাকেন্দ্র (ভি.ই.আর.সি) এর একটি ব্যতিক্রমী ভূমিকা রয়েছে।

এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৭৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে উন্নয়ন ক্ষেত্রে সহযোগী ভূমিকা পালনের জন্য একটি জাতীয় পর্যায়ের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। এ সংগঠনের মৌলিক লক্ষ্যগুলো হল:

ব্যাপক দরিদ্র জনগণকে উন্নয়ন কর্মে সক্রিয় অংশগ্রহণে সহযোগিতা করা।

উন্নয়ন কার্যে সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন প্রকার অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কলাকৌশল, উপকরণ উদ্ভাবন, প্রয়োগ এবং অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের আয়োজন।

বিভিন্ন যোগাযোগ উপকরণ যেমন: সাফল্যের ব্যর্থতার কাহিনী সংগ্রহ, প্রকাশ ও বিতরণ।

সরকারি ও বেসরকারি সংগঠনসমূহের উন্নয়নমূলক বিশেষভাবে গণশিক্ষা কর্মসূচীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ এবং সম্ভাব্য সহযোগিতা প্রদান।

উন্নয়নগামী দেশ হলেও এখনও বাংলাদেশ পশ্চাৎপদ ও দারিদ্রে নিমগ্ন। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সাথে মিল রেখে ভি.ই.আর.সি জনগণের সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করছে, যার আসল উদ্দেশ্য হল জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দারিদ্রমোচোন করে দেশের ব্যাপক গ্রামীন জন-গোষ্টির মানবিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন। এ পর্যন্ত ভি.ই.আর.সি ৮০০০ এরও বেশি পুরুষ ও মহিলাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। যার উদ্দেশ্য হচ্ছে সচেতনতা সৃষ্টি, দক্ষতা বৃদ্ধি ও সংগঠনের মাধ্যমে উন্নয়ন কাজে অংশগ্রহণ। নির্দিষ্ট ৬টি কর্ম এলাকায় গ্রামীণ দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের সমিতি বা সংগঠন সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হিসেবে কাজ করছে এই সব সংগঠন পুরুষ ও মহিলাদের ঐক্যবদ্ধ করেছে। সঞ্চয়ে উদ্বুদ্ধ করেছে। সঞ্চয় ও ঋণের মাধ্যমে পুঁজি সৃষ্টি করে উৎপাদনমূলক কর্মসূচী নিতে সহায়তা করেছে। এছাড়াও শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, বৃক্ষ রোপন, পরিবেশ সংরক্ষণ, রোগ প্রতিরোধক ব্যবস্থাদি যেমন: স্বাস্থ্য শিক্ষা, স্বাস্থ্য সম্মত পায়খানা, পানীয় জলের কল বসানের কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে।

শুরু থেকেই ভি,ই,আর,সি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে সাথে নিরক্ষরতা দুর করার জন্য বয়স্ক শিক্ষা ও শিশু শিক্ষার উপর জোর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। এক্ষেত্রে অর্জিত অভিজ্ঞতা অন্যান্য সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার সাথে বিনিময় করে আসছে। ভি,ই,আর,সির অভিজ্ঞতার মধ্যে কর্মসূচী পরিকল্পনা, বাস্তবায়ন, অনুসরণ, মূল্যায়ণ ছাড়াও রয়েছে উপকরণ তৈরি, ওরিয়েন্টেশন প্রদান ইত্যাদি। এ পর্যন্ত ভি,ই,আর,সি ৬১টি বিভিন্ন ধরনের শিক্ষা উপকরণ তৈরি অথবা উন্নয়ন সাধন করেছে যেগুলো এর নিজস্ব কর্মসূচীতে প্রয়োগ করা ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনের কর্মসূচীতেও প্রয়োগ করা হয়েছে। এসব উপকরণ সমূহ ইতিমধ্যেই দেশ ও বিদেশে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং বিভিন্নভাবে পুরষ্কৃত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ভি,ই,আর,সি উপকরণ তৈরি, উপকরণ তৈরি প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত কর্মশালা ও প্রদর্শনীতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে অবদান রেখেছে। নিজস্ব কর্মএলাকায় প্রতি বছর ২০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ৫০০ শিশু ও আরও ৫০০ নারী ও পুরুষকে সাক্ষর করে তোলার কাজ ভি,ই,আর,সি করে আসছে। দরিদ্র ও অবহেলিত শিশুদের স্কুলমুখী করে তোলা ও খেলাধুলার মাধ্যমে আকৃষ্ট করার জন্যও স্থানীয়ভাবে স্বল্পমুল্যে উপকরণ তৈরি করা হয়েছে যেমন: বাঁশের স্কেল, মাটির অক্ষর ইত্যাদি। বয়স্ক মহিলা ও পুরুষদের ব্যবহারিক জীবনের চাহিদা মাফিক বিভিন্ন অনুসারক বই পত্র, পোষ্টার, টেপড্রামা ইত্যাদি তৈরি করা হয়েছে এবং ব্যবহৃত হচ্ছে।

নিজস্ব কর্মসুচী ছাড়াও ভি.ই.আর.সি বাংলাদেশ পল্লী উন্নয়ন বোর্ডের (বি.আর.ডি.বি.) সংগে একযোগে ১৯৮০-৮১ সালে মহিলা সমবায়ীদের মধ্যে থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণের কাজ করে আসছে। প্রাথমিক পর্যায়ে জয়দেবপুর, গোপালপুর ও কালিয়াকৈর উপজেলায় ৫০০ জন মহিলাকে সাক্ষর করা হয়। পরবর্তী পর্যায়ে আরো ১১টি উপজেলায় মোট ১১০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৩০০০ মহিলা সমবায়ীকে সাক্ষর করে তোলা হয়। বর্তমানে ঐ যৌথ প্রকল্পের অধীনে কোটালীপাড়া, পিরোজপুর, বাবুগঞ্জ, রাংগুনিয়া, সীতাকুণ্ড ও গোপালগঞ্জ উপজেলায় আরো ৬০টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১৫০০ জন মহিলা সাক্ষরতা কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেছেন। বর্তমানে পূর্বতন ১৪টি উপ-জেলায়ও নতুনভাবে কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। সাক্ষরতাপ্রাপ্ত মহিলাদের ভালো বিয়ে হয়েছে এবং অনেকেই বিভিন্ন চাকরিতে নিয়োজিত হয়েছেন। এই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় দুই শতাধিক মহিলা শিক্ষিকা হিসেবে এবং বিশ জনেরও বেশি মহিলা তত্ত্বাবধায়িকা হিসেবে প্রশিক্ষণ লাভ করে কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

১৯৮৪-৮৫ সালে শিক্ষা মন্ত্রনালয়ের আহবানে ভি.ই.আর.সি প্রায় ৩০টির মত শিক্ষা উপকরণের প্রটোটাইপ প্রস্তুত করেন। আশা করা যায় ভবিষ্যৎ গণশিক্ষা কর্মসূচীতে ঐসব উপকরণ ব্যবহৃত হবে। উপকরণগুলোর মধ্যে প্রাইমার, শিক্ষক সহায়িকা, অনুসারক বই, পোষ্টার, চার্ট, ব্লাকবোর্ড শ্লেটের নমুনা ইত্যাদি রয়েছে। এইসব উপকরণ তৈরি করার সময় প্রায় ১৫টি সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা কাজে লাগানো হয়েছে।

ভি.ই.আর.সি এ পর্যন্ত ছোট বড় ৭০টিরও বেশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের অপ্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা/বয়স্ক শিক্ষা/ শিশু শিক্ষার কর্মসূচীর সাথে সহযোগিতা করে আসছে। সহযোগিতার ধরনগুলো হলো প্রশিক্ষণ,পরামর্শ দান, উপকরণ সরবরাহ ইত্যাদি।

দেশের এই নিরক্ষরতার সমস্যা দুর কারার জন্য ভি.ই.আর. সি সংশ্লিষ্ট সবার সাথে একাত্ম হয়ে কাজ করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ভি.ই.আর.সির উন্নয়নকর্মীরা বিশ্বাস করেন যে, সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার সমন্বয়ে একটি জাতীয় কর্মসূচী হাতে নেয়া হলে (যা রাজনীতি ও দলীয় কোন্দল থেকে দূরে থাকবে) আমাদের দেশ থেকে নিরক্ষরতা দুর করা সম্ভব। আমাদের সবার লক্ষ্য হবে সুন্দর সুখী সমাজ গড়ে তোলা। আমাদের সবার প্রতিজ্ঞা হবে আর দেরী না করে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে গণশিক্ষা কর্মসূচী বাস্তবায়নে অগ্রসর হওয়া। অভিজ্ঞতার আলোকে আরো সুন্দর কর্মসূচী গড়ে তোলা।

জুন মাসের নামের উৎস

রোমানদের হাতে ক্যালেন্ডারের জন্ম ও বিকাশ হয়েছে বলে এর অনেক মাসের নামই রোমান দেব-দেবীর নামে। দুটি মাস সম্রাটের নামে ও অপর মাসগুলোর নাম ক্রমিক সংখ্যানুসারে হয়েছে। রোমানদের সময়ে ক্যালেন্ডারে ১০ মাস ছিল। রাজা নুমা লুম্পিয়াস ৭১৩ অব্দে ঐ ক্যালেন্ডারে জুড়ে দেন বাকি দু'টি মাস। পৌরাণিক দেবতা যাদের নাম কয়েকটি মাসের নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে তারা হলেন শুরু ও শেষের দেবতা ভ্যানুস, যুদ্ধ দেবতা মার্স এবং পৌরাণিক দেবীরা হলেন আফ্রেদিতি, মহতী দেবী 'মাইয়া' ও দেবতাদের রানী জুনো। জুনো ছিলেন দেবরাজ জুপিটারের স্ত্রী। জুনোর গ্রীক নাম হেরা। জুনো মহিলাদের বিবাহের এবং মঙ্গলের দেবী ছিলেন। রোমানরা বিশ্বাস করতেন, প্রত্যেক মানুষের একটি অদৃশ্য সত্তা রয়েছে। যা সারা জীবন মানুষটির দেখাশুনা করে থাকে। তারা এর নাম দিয়েছিলেন জিনিয়াস। এ জিনিয়াস মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না বলে তারা বিশ্বাস করতেন। সে ক্ষেত্রে মহিলাদের সারাজীবন দেখাশোনা করেন জুনো। রোমানদের বিশ্বাস ছিল প্রাচীন ক্যালেন্ডারের কালেন্দে- এর প্রতি মাসের প্রথম দিনটি জুনোর নিয়ন্ত্রণে। তাই প্রতি মাসের প্রথম দিনকে জুনোর দিন বলে উল্লেখ করা হতো। দেবরাজ জুপিটার দেবতাদের সন্ত্রস্ত করে রাখতেন, কিন্তু নিজ স্ত্রী জুনোকে ভয় পেতেন। মূলত জুন মাসের নামকরণ করা হয়েছিল রোমান পৌরাণিক দেব জুনোর নামানুসারে।

জুন মাসের বিভিন্ন দিবস

২ জুন	লোকনাথ ব্রহ্মচারীর তিরোধান দিবস
৫ জুন	বিশ্ব পরিবেশ দিবস
১০ জুন	বিশ্ব ভূমি অধিকার দিবস
১২ জুন	বিশ্ব শিশু শ্রম প্রতিরোধ দিবস
১৪ জুন	মাগুরছড়া দিবস
১৬ জুন	সংবাদপত্রের কালো দিবস
১৭ জুন	আন্তর্জাতিক নারী স্বাস্থ্য দিবস
১৭ জুন	বিশ্ব মরুময়তা দিবস
২০জুন	বিশ্ব শরণার্থী দিবস
২০জুন	বিশ্ব বাবা দিবস (তৃতীয় রবিবার)
২৩ জুন	ঐতিহাসিক পলাশী দিবস
২৩ জুন	আন্তর্জাতিক এসওএস শিশু পল্লী দিবস
২৬ জুন	আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস
২৬ জুন	নির্যাতিতদের সপক্ষে আন্তর্জাতিক দিবস
৩০ জুন	সিধু কানু দিবস (সাঁওতাল বিদ্রোহ)

-জনকণ্ঠ, ০২-০৬-০৬

স্বাবলম্বী, ২৮ বর্ষ: ৩য় সংখ্যা: এপ্রিল-জুন, ২০০৬

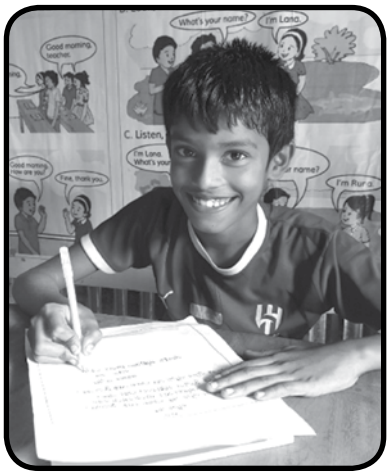

আমান উল্লাহ
রায়পুরা পশ্চিমপাড়া শিখন কেন্দ্র

সীমা নাই

মোদের খুশির সীমা নাই মোরা ভার্ক স্কুলে যাই।
বই পাবো পেন্সিল পাবো আরো পাবো খাতা
খুশি হয়ে স্কুলেতে পাঠাইবেন মোর মাতা।
মোদের খুশির সীমা নাই মোরা ভার্ক স্কুলে যাই।

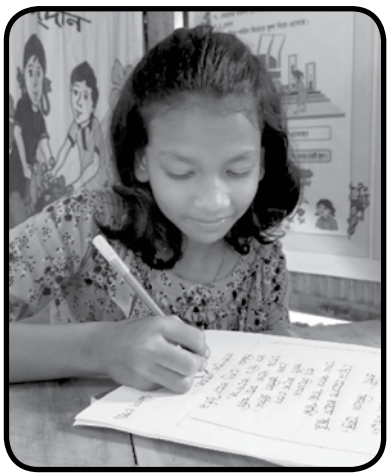

সুমাইয়া
রায়পুরা পশ্চিমপাড়া শিখন কেন্দ্র

ছোট্ট শিখন কেন্দ্র

আমাদের এই সবুজ গাঁয়ে
একটি শিখন কেন্দ্র
ছেলে মেয়েরা আসে শুধু
লেখা পড়ার জন্য
লেখা পড়ার পাশাপাশি
হয় বিনোদন
তারই মাঝে গড়ব
মোরা ভবিষ্যৎ জীবন
দেশে এলো মহামারি
নাম ছিল করোনা
শিখন কেন্দ্র ফিরিয়ে দিলো
হারানো প্রেরণা।